পেট্রোর কথা

ইমদাদুল হক মিলন

কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্টের সেই কফি শপটায় বেশ মজার একটা ঘটনা ঘটল। দোতলার ফাস্টফুডের দোকান থেকে নাশতা করে ফিরেছি। অপেক্ষার সময়টা কিছুতেই আর শেষ হচ্ছে না। কখন সাতটা বাজবে, কখন প্লেনে চড়ব, কখন গিয়ে নারিতায় পৌঁছাব। বড় দেশগুলোর ইমিগ্রেশন বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের লোক পেলেই নানা ধরনের প্রশ্ন করে, বিব্রত করার ভঙ্গিতে চেক করে। নাইন ইলেভেনের পর ফোবানা সম্মেলনে গিয়েছিলাম ডালাসে। সেবার ডালাসে গিয়েছিলেন প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, যায় যায় দিন সম্পাদক শফিক রেহমান আর লেখক হিসেবে আমি। ডালাসের মাইক্রোটেল ইন নামের একটা হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা। মতি ভাই, শফিক ভাই- ওঁরা আগেই চলে গিয়েছিলেন। আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। যেতে হয়েছিল একদম একা। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের টিকিট পাঠিয়েছিল সম্মেলন কর্তৃপক্ষ। ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর থেকে নারিতা, নারিতা থেকে লসএঞ্জেলেস, লসএঞ্জেলেস থেকে লাসভেগাস, সেখান থেকে ডালাস। একা এরকম একটা জার্নি, উহ, ভাবাই যায় না। ফিরেও ছিলাম একা। কথা প্রসঙ্গে সেই ভ্রমণের কথা এই লেখায় নিশ্চয় আসবে। তবে সেই প্রথম নারিতা এয়ারপোর্টে একঘণ্টা ছিলাম। এবারের আগে সেই আমার প্রথম জাপানে আসা, বুড়ি ছুঁয়ে যাওয়ার মতো জাপান দেশটিকে একটুখানি ছুঁয়ে যাওয়া।

আমার প্রিয়বন্ধু মুহাম্মাদ জুবায়ের বহু দিন ধরে ডালাসে। বহুদিন জুবায়েরের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। জানতাম জুবায়ের ডালাসে থাকে। নব্বই সালে ‘কিশোর তারকালোক’ নামের ছোটদের একটি পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলাম আমি। সেই পত্রিকায় আর্টিস্টের কাজ করত স্মার্ট হ্যান্ডসাম এক যুবক। নাম আলী আকবর। তখন আর্ট কলেজে পড়ে সে। আজকের বিখ্যাত শিল্পী ধ্রুব এষের বন্ধু। অসম্ভব প্রাণবন্ত, মাইডিয়ার টাইপের যুবক। আমি তাকে ডাকতাম ‘বালক’। ডালাসের ফোবানা সম্মেলনের আগে ঢাকায় এসেছিল আকবর, সঙ্গে আমার আমন্ত্রণপত্র ইত্যাদি নিয়ে এসেছিল। ওর সঙ্গে জুবায়েরের খুব ভাব। কিন্তু জুবায়েরের ঠিকানা টিকানা কিছুই আমি জানি না। আকবরের কাছ থেকে রাখতেও মনে নেই। একদার বিখ্যাত

> জুবায়েরের সঙ্গে কী যে আনন্দে কেটেছিল ডালাসের দিনগুলো! হোটেল থেকে সে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল তার বাড়িতে। এলেন নামের চমৎকার একটি জায়গায় জুবায়েরের ছবির মতো বাড়ি। বাড়ির সামনের লনে কয়েকটি চাঁদনি রাত কী যে অসাধারণ আড্ডা দিয়েছি আমরা! জুবায়ের, তার বউ শাহিন, আলী আকবর, আকবরের আমেরিকান বউ, নাসরিন নামের চমৎকার একটি মেয়ে, ওর বরও ছিল, ছেলেটির নাম আমি ভুলে গেছি।

অভিনেতা, টিভি প্রযোজক আল মনসুর, মানে আমাদের বেলাল ভাইও থাকেন ডালাসে। যে রাতে গিয়ে ডালাসে পৌঁছালাম সে রাতেই বেলাল ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো। এখনও অবিকল আগের মতোই আছেন তিনি। হাস্যরসে ভরপুর প্রাণবন্ত যুবকটি। তার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে হোটেলে এসে ঘুমিয়েছি, রাত কেটে গিয়ে পরদিন প্রায় দুপুর, ঘুম আমার ভাঙছেই না। হঠাৎ ডোরবেল বাজল। ঘুম চোখে দরজা খুলেছি, দেখি হাফপ্যান্ট, কেডস আর টিশার্ট পরে জুবায়ের দাঁড়িয়ে আছে। তাকে টেনিস খেলোয়াড়দের মতো দেখাচ্ছে। আমাকে দেখেই বলল, চিনতে পারিস?

জুবায়েরের সঙ্গে কী যে আনন্দে কেটেছিল ডালাসের দিনগুলো! হোটেল থেকে সে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল তার বাড়িতে। এলেন নামের চমৎকার একটি জায়গায় জুবায়েরের ছবির মতো বাড়ি। বাড়ির সামনের লনে কয়েকটি চাঁদনি রাত কী যে অসাধারণ আড্ডা দিয়েছি আমরা! জুবায়ের, তার বউ শাহিন, আলী আকবর, আকবরের আমেরিকান বউ, নাসরিন নামের চমৎকার একটি মেয়ে, ওর বরও ছিল, ছেলেটির নাম আমি ভুলে গেছি। আকবরের বউও পেইন্টার। দু'একটি বাংলা বাক্য আকবর ততদিনে কে শিখিয়েছে। এক রাতে বেলাল ভাই একাই জমিয়ে রাখলেন আড্ডা। আরেক রাতে জমিয়েছিলেন আমাদের মতি ভাই।

যা হোক, ডালাস থেকে ফ্লোরিডায় যাচ্ছি বীণাখালার ওখানে। জুবায়ের তার বিশাল জিপ নিয়ে আমাকে সি অফ করতে এসেছে। আমি ইমিগ্রেশন ক্রস না করা পর্যন্ত ও দাঁড়িয়ে রইল। কাচের দেয়ালের বাইরে জুবায়ের, ভেতরে আমি। আমাকে তখন কালো, মধ্যবয়সী, সাড়ে ছ'ফুটের মতো লম্বা এক আমেরিকান সিকিউরিটি লোক চেক করছে। ও মাই গড! চেক কাহাকে বলে। জুতা মোজা বেল্ট সবই খুলল। শুধু শার্ট প্যান্ট আন্ডারওয়্যার বাকি! আর শরীরের এমন সব জায়গায় হাতাপিতা করল, বলতে লজ্জা করছে। একা থাকলে লজ্জাটা আমি তেমন পেতাম না। কিন্তু আমার এহেন দশা জুবায়ের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, লজ্জাটা পাচ্ছিলাম জুবায়েরের জন্যে। একবার লন্ডনে গেছি, হিথরো এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন অফিসার আমার পাসপোর্ট দেখে বলল,

: ও তুমি লেখক?

: হ্যাঁ।

: কী লেখ?

: ফিকশান।

: লন্ডনে কেন এসেছ?

: বেড়াতে।

: তোমাদের দেশের লেখকরা লন্ডনে বেড়াতে আসার ক্ষমতা রাখে?

: মানে?

: মানে আর্থিক ক্ষমতার কথা বলছি। তোমাদের দেশটি তো অতি দরিদ্র।

পৃথিবীর বড় দেশগুলোতে গিয়ে এই ধরনের অপমান যে কত হয়েছি! আবার মজার ঘটনাও ঘটেছে কোথাও কোথাও। প্যারিসের চার্ল দ্য গল এয়ারপোর্টে নেমেছি, পাসপোর্টের ছবিতে আমার গোঁফ আছে, বাস্তবে নেই। গোঁফের বয়স চুলের চে' সতেরো আঠারো বছর কম হওয়ার পরও গোঁফ জিনিসটাই আগে পাকে। আমারটাও যথারীতি পেকেছে। একদিন হুট করে ফেলে দিলাম। যারা গোঁফ রাখে তারা হুট করে গোঁফ ফেলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে মাকুন্দা টাইপ হয়ে যায়। আমিও হয়ে গেলাম। আমার বড় মেয়েটার বয়স তখন আট ন'বছর। রাতেরবেলা গোঁফ ছাড়া বাড়ি ফিরেছি, হঠাৎ সে আমাকে দেখে প্রথমে থতমত খেল, তারপর কাঁদতে শুরু করল। কান্নার কারণ, আমার চেহারা বদলে গেছে। আমাকে তার বাবা মনে হচ্ছে না।

চার্ল দ্য গল এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন অফিসার মোটা মতন একটি মহিলা, তার অবস্থাও দেখি আমার মেয়ের মতন। গোঁফ ছাড়া আমাকে চিনতেই পারে না। একবার পাসপোর্টের ছবি দেখে আরেকবার আমার মুখের দিকে তাকায়। প্রায় চার পাঁচ মিনিট। মহিলাটি তেমন ইংরেজি জানে না। এক সময় দু'হাতের আঙুল তুলে মজাদার একটা ভঙ্গি করে, ইশারায় জানতে চাইল, তোমার গোঁফ কোথায়? আমিও মহিলার কায়দায় দু'হাতের ইশারায় বোঝালাম, ফেলে দিয়েছি। মহিলার তারপর সে কী হাসি।

এসব কারণে যে দেশেই যাই ইমিগ্রেশন আমার কাছে একটা আতঙ্ক। যতক্ষণ আসল জায়গাটা ক্রস করতে না পারি একটা টেনশন আমার থাকেই। নারিতা নিয়েও এই ধরনের একটা আতঙ্ক কাজ করছিল। সেই আতঙ্ক চেপে দলবল নিয়ে আবার সেই কফিশপটায় গিয়ে বসেছি, দুলাল গিয়ে কফির অর্ডার দিয়ে এল। কিছুক্ষণ পর কাউন্টারের মেয়েটি কফি ছাড়াই এসে হাজির। আগে পে করো, তারপর কফি।

চার্ল দ্য গল এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন অফিসার মোটা মতন একটি মহিলা, তার অবস্থাও দেখি আমার মেয়ের মতন। গোঁফ ছাড়া আমাকে চিনতেই পারে না। একবার পাসপোর্টের ছবি দেখে আরেকবার আমার মুখের দিকে তাকায়। প্রায় চার পাঁচ মিনিট। মহিলাটি তেমন ইংরেজি জানে না। এক সময় দু'হাতের আঙুল তুলে মজাদার একটা ভঙ্গি করে, ইশারায় জানতে চাইল, তোমার গোঁফ কোথায়? আমিও মহিলার কায়দায় দু'হাতের ইশারায় বোঝালাম, ফেলে দিয়েছি।

আমার খুব প্রেস্টিজে লাগল। দুলাল না মনির, নাকি নিশাত, কে যেন পে করতে চাইল। আমি হাত তুলে থামালাম। মানিব্যাগ বের করে একটা একশ' ডলারের নোট মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিলাম। ওই দেখে ঠিক চীনাজোঁকের মতো লাফ দিল মেয়েটি। নো নো, তু বিগ, তু বিগ।

জানতাম এরকম একটা কা-ই হবে। আমি আসলে মেয়েটিকে বোঝাতে চেয়েছিলাম, গরিব দেশের মানুষ হলেও, তোমার কফি খেয়ে, পে না করে আমরা পালাব না। এ

আসলে এক ধরনের প্রতিশোধ নেয়া।

দ্বিতীয়বার জার্মানিতে গিয়ে ঠিক এরকম নয়, এর কাছাকাছি একটা ঘটনা ঘটেছিল সিনডেলফিনগেনের হলিডে ইন হোটেলে। সেই ঘটনার আগে আরেকটি ঘটনা বলে নিই। ওটাও জার্মানিতে ঘটেছিল। স্টুটগার্ট থেকে আমি তখন সিনডেলফিনগেনে কাজ করতে যাই। টুবিংগারস্ট্রাসে থেকে বাসে চড়ে সিনডেলফিনগেনের সোয়ার্ত স্ট্রাসেতে গিয়ে নামি। বাসটা আসে বানহোফট থেকে। আমার স্টপেজ থেকে বাসে উঠে রোজই খুব সুন্দরি একটি যুবতীকে দেখি। দামি পোশাক-আশাক আর সাজগোজে তাকে এই পৃথিবীর মানুষই মনে হয় না। মনে হয় স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। হুরপরী বলতে যা বোঝায় একদম তাই। আর অতি সুন্দরি মেয়েদের যা হয়, শরীর মন দুটোই অহঙ্কারে ভরা থাকে। কারও দিকে সাধারণত তাকায়ই না। তাকালেও নিতান্তই দয়া করে তাকায়। মুখে হাসি তো থাকেই না, অযথাই গম্ভীর মুখ। যদিও বা হাসে, সেটি প্রাণখোলা নয়। আরোপিত। এই মেয়েটিও তাই। বাসের কারও দিকে সে তাকায়ই না, হাসাহাসি কিংবা কথা বলা তো দূরের কথা। হাবভাবে বোঝা যায় চাকরিটাও সে বড়ই করে। বাসে তার চড়ার কথা না। হয়তো কোনো সাময়িক অসুবিধার জন্য চড়ছে। ওসব দেশে বাস ট্রেন কিংবা ট্রামে যে কেউ যে কারো পাশে বসতে পারে। মেয়েটির পাশেও কেউ না কেউ বসে। যারা বসে তারা সবাই জার্মান কিংবা ইউরোপের অন্যান্য দেশের। অর্থাৎ সাদা চামড়ার। ওই বাসের একমাত্র ময়লা চামড়ার মানুষ আমি। অর্থাৎ বাংলাদেশ নামের গরীব একটি দেশের মানুষ। ওই মেয়েটি তো দূরের কথা, সাদা পুরুষগুলো পর্যন্ত আমার দিকে তাকিয়ে দেখে না।

এক সকালে বাসে চড়ে দেখি সব সিটই দখল হয়ে গেছে, শুধু সেই মেয়েটির পাশের সিটটা খালি। সে একা গম্ভীর মুখ করে বসে আছে। আমি কিছু না ভেবেই তার পাশে বসে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। উঠে হান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে রইল। পুরো পথটা সে ওইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গেল।

কেন?
কী কারণ?

কারণ একটাই। আমার মতন ময়লা রঙের দরিদ্র বিদেশির পাশে সে বসবে না। গভীর অপমানে সেদিন আমার আত্মায় কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল।

ফেরার পথেও একই বাসে ফিরতাম আমরা। আমি চড়তাম যুবতীর দু'স্টেশন আগে। একদিন ফেরার পথে পুরো বাস ভর্তি, আশ্চর্যজনকভাবে আমার পাশের সিটটা খালি। সে এসে উঠল। পুরো বাসের ভেতরটা একবার তাকিয়ে দেখে ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালো। বোধহয় ক্লান্ত ছিল, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, আমার পাশে বসে পড়ল।

প্রিয় পাঠক, বলুন তো এই অবস্থায় আমার কী করা উচিত? হ্যাঁ, যা করা উচিত আমি তাই করলাম। সেদিনকার সেই অপমান তীব্রভাবে লেগেছিল আমার মনে। যুবতী বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম। প্রথমে ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝতে পারেনি। অবাক হয়েছিল। কোনো স্টপেজে থামেনি তো বাস, তাহলে কী কারণে আমি উঠে দাঁড়ালাম! আমি তারপর সেদিনকার সেই তার মতো করে বাসের হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়েটি বুদ্ধিমতী। ব্যাপারটা সে বুঝে গেল। দু'একবার লজ্জিত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে মুখ নিচু করে রইল। কিন্তু আমি একবারও আর তার দিকে তাকাইনি।

জীবনে ঘটে যাওয়া গল্প উপন্যাস সিনেমা নাটককেও অনেক সময় হার মানায়। সপ্তাহখানেক পর একই ঘটনা ঘটল আবার। আমি বসে আছি, সেদিনও আমার পাশের সিটটা খালি, যুবতী তার স্টপেজ থেকে ফিরতি বাসে উঠেছে। সিট খালি দেখে আমার পাশে বসার সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম। সে তখন অদ্ভুত একটা আচরণ করল, চট করে আমার একটা হাত চেপে ধরল। এতটা আমি আশা করিনি। থমথমে মুখে তার দিকে তাকিয়েছি, করুণ এবং লজ্জিত ভঙ্গিতে সে বলল, আমি খুব, খুব দুঃখিত। আমি যা করেছি, তুমিও তাই করেছ। এই নিষ্ঠুরতা যে কী অমানবিক, আমি আজ বুঝতে পারছি। আমার আচরণের জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তুমি আমার পাশে এখন না বসলে অপমানে আমি মরে যাব। আমি আর কথা বলিনি। কয়েক পলক তার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে পড়েছিলাম। সেই অসাধারণ যুবতীর নাম ছিল পেট্রা। পেট্রাকে নিয়ে এর পরের ঘটনাগুলো আমি আর বলব না।

থমথমে মুখে তার দিকে তাকিয়েছি, করুণ এবং লজ্জিত ভঙ্গিতে সে বলল, আমি খুব, খুব দুঃখিত। আমি যা করেছি, তুমিও তাই করেছ। এই নিষ্ঠুরতা যে কী অমানবিক, আমি আজ বুঝতে পারছি। আমার আচরণের জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তুমি আমার পাশে এখন না বসলে অপমানে আমি মরে যাব। আমি আর কথা বলিনি। কয়েক পলক তার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে পড়েছিলাম। সেই অসাধারণ যুবতীর নাম ছিল পেট্রা। পেট্রাকে নিয়ে এর পরের ঘটনাগুলো আমি আর বলব না।

এ ফিচার সম্পর্কে আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে
আমাদের ইমেইল করে জানাতে পারেন
editor@priyobangla.com